নরেশ গুহ-র ইয়েট্‌স্‌ চর্চা

শীর্ষেন্দু মজুমদার

বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্‌কে নিয়ে বাঙালির মনে বেশ উৎসাহ জন্মায়। এর কারণ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং (প্রাথমিকভাবে) ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'। ১৯১২ সালে অমলচন্দ্র হোম একটি চিঠিতে ইয়েট্‌স্‌-এর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তাঁর 'দ্য কেলটিক টুয়ালাইট' গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি চান। সেই অনুমতি ইয়েট্‌স্‌ দিয়েওছিলেন। সেই সময়ে অজিতকুমার চক্রবর্তী ইয়েট্‌স্‌ ও আইরিশ লিটারারি রিভাইভ্যাল নিয়ে বেশ মনোজ্ঞ প্রবন্ধও লেখেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের ইয়েট্‌স্‌-এর ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে প্রশস্তি 'কবি ইয়েটস' নামক প্রবন্ধে, তা সুবিদিত। তবে প্রথম বাঙালি যাঁকে ইয়েট্‌স্‌ দেখেন এবং যাঁর কাছ থেকে ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শন ও ভাবনার গভীর পাঠ গ্রহণ করেন তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। মোহিনীমোহন ছিলেন থিওসফিস্ট, যেমন দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজেও বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন কিছুদিন। পরে তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, মোহিনীমোহনের পুত্র, ইয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মোহিনীমোহনের প্রভাব এতটাই গভীর ছিল এই আইরিশ কবির হৃদয়ে যে তিনি তৎক্ষণাৎ 'টু মোহিনী চ্যাটার্জি' নামক একটি কবিতা লিখে তপনমোহনকে সমর্পণ করেন। এটি নিঃসন্দেহে মোহিনীমোহনের উদ্দেশ্যে ইয়েট্‌স্‌-এর একটি বড় ট্রিবিউট। ইংরাজি গীতাঞ্জলি পর্বে ইয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের, যাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্য জেনে ইয়েট্‌স্‌ ইংরাজি গীতাঞ্জলির সেই স্মরণীয় ভূমিকা লিখেছিলেন। সরোজিনী নাইডুকেও ইয়েট্‌স্‌ চিনতেন এবং ওঁর ইংরাজি চিঠিপত্রের ভূয়সী প্রশংসাও তিনি করেছেন। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার যখন ইংল্যাণ্ডে যান তখন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইয়েট্‌স্‌-এর সাক্ষাৎ হয় এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা রথীন্দ্রনাথের 'অন দ্য এজেস অফ টাইম' বা 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে পাই। কিন্তু ইয়েট্‌স্‌ প্রবেশ করেছিলেন / করে আছেন বাঙালির কালচারাল ইম্যাজিনেশনে। জীবনানন্দ থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পার করে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পর্যন্ত অনেকেই ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা ও কাব্যনাট্য অনুবাদ করেছেন বাংলায়। প্রাথমিক পর্বে ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা না পড়লেও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়েছেন; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে নিয়ে ইয়েট্‌স্‌ কাব্য সমগ্র পড়েছেন এবং ইয়েট্‌স্‌-এর শেষের দিকের বেশ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থও ইংল্যাণ্ড থেকে আনিয়েছেন। কাজেই ইয়েট্‌স্‌ চর্চার একটি মননশীল ধারা আমাদের বাংলায় ও বাঙালির আছে।

এই ধারা প্রবাহিত হয়েছে সারস্বত চর্চার ক্ষেত্রেও। নরেশ গুহ-র ইয়েট্‌স্‌ চর্চা এই ধারারই অংশ বললে বোধহয় ভুল হবে না। তবে বাঙ্গালির সারস্বত ইয়েট্‌স্‌ চর্চার ক্ষেত্রে নরেশ গুহ পথিকৃৎ নন।

১৯৪৫ সালে অবিনাশচন্দ্র বোস ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনে ইয়েটস, এ.ই., (জর্জ রাসেল) ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গবেষণা করতে যান। অবিনাশের ডাবলিনে আগমনের খবর আইরিশ পত্রিকাতে ছাপা হয়। এই গবেষণাপত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে 'থ্রি মিস্টিক পোয়েটস : এ স্টাডি অফ ডব্লিউ. বি. ইয়েটস, এ. ই. এ্যাণ্ড রবীন্দ্রনাথ টেগোর' শিরোনামে। এছাড়া অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ও মার্কিন মুলুকেই ইয়েট্‌স্ নিয়ে গবেষণা করেন ১৯৫০-এর দশকে। সেই গবেষণার ফসল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে, ওরিয়েন্ট লংম্যানস থেকে, যদিও এটির টাইপস্ক্রিপ্ট তৈরি হয় ১৯৫৪ সালেই। ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থের শিরোনাম 'দ্য পোয়েট্রি অফ ডব্লিউ. বি. ইয়েটস' এবং এই শিরোনাম থেকে অনুমেয় যে তিনি ইয়েট্‌সের কবিতাকে কেন্দ্র করেই তাঁর গ্রন্থ (তথা গবেষণা) লিখেছেন। মুখবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে তাঁর উদ্দেশ্য 'to examine the richness and complexity of his symbolism'। যদিও তিনি কবিকে তাঁর জীবন, এবং তাঁর উপর যে রাজনৈতিক, দার্শনিক ও সাহিত্যমূলক প্রভাব পড়েছে, সেগুলির নিরিখেই বিচার করেছেন। নরেশ গুহ-র ইয়েট্‌স্ চর্চার অভিমুখ কিন্তু ইয়েট্‌সের কবিতা বা নাটক নয়। নরেশ গুহ-র গ্রন্থের শিরোনাম 'ডব্লু. বি. ইয়েটস : এ্যান ইণ্ডিয়ান এপ্রোচ'। প্রকাশক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২ সাল। কাজেই একই বছরে দুজন বাঙালি গবেষকের ইয়েট্‌সের উপর গ্রন্থ প্রকাশ কাকতালীয় হলেও আমাদের একটু সুবিধা করে দিয়েছে। আমরা দুটি গ্রন্থকে পাশাপাশি পড়ার সুযোগ পাই এবং দুই গবেষকের দুটি আলাদা আঙ্গিককে ভালভাবে বুঝতে পারি। নরেশ গুহ-র গ্রন্থের শিরোনাম আমাদের ইয়েট্‌সের কাব্যপ্রভাব এবং ভাবনার একটি জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনেক ছোটবেলা থেকেই ইয়েট্‌স্ তাঁর মামার বাড়ির প্রভাবে এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে, থিওসফি, বৌদ্ধধর্ম, প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে আইরিশ পল্লী সংস্কৃতি (folklore) ও গ্রামীণ মানুষের ম্যাজিক ও পরজগতে বিশ্বাসের এক সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন।

নরেশ গুহ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইয়েট্‌সের পারলৌকিক বিশ্বাস ও প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবের ফলে তাঁর মনন জগতের একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। কেবল ইয়েট্‌সই নন, নরেশ গুহ প্রাচ্য ভাবধারা ও পারলৌকিক বিশ্বাস কীভাবে অন্যান্য আইরিশ কবিদের প্রভাবিত করেছিল তাঁর নিদর্শন দিয়েছেন। খুব সঙ্গতভাবে সেখানে উঠে এসেছে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথা। কিন্তু ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৭-এর মধ্যে যেসব কবিতা ভারতীয় মিথলজির উপর ভিত্তি করে ইয়েট্‌স্ লিখেছিলেন, সেগুলির যে খুব গূঢ় বিশ্লেষণ নরেশ গুহ করেছেন তা নয়। এ কথা অনস্বীকার্য যে পরবর্তীকালে যিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, তিনি ইয়েট্‌সের কবিতার তেমন বিশ্লেষণ/পাঠ এড়িয়ে গেলেন, এটা কিছুটা অনভিপ্রেত। সেই তুলনায় ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ইয়েট্‌সের কবিতাপাঠে রয়েছে সাহিত্য তথা কাব্য রসের গভীর বোধ। সাহিত্যপ্রেমী যে কোনও মানুষের কাছে ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়ের ইয়েট্‌স্ অনেক বেশি সুখপাঠ্য। নরেশ গুহ যে ইয়েট্‌সের প্রথম জীবনের ভারতীয় বিষয়মূলক কবিতার আলোচনা করেছেন, সেখানে তিনি কবিতাগুলির দার্শনিক প্রেক্ষিতে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন যে ইয়েট্‌স্ অনেক কবিতা পরবর্তীতে তাঁর কাব্যসংগ্রহ থেকে বাদ দিয়েছিলেন কারণ সেগুলিতে দেখা দিচ্ছিল এক প্রচ্ছন্ন নিয়তিবাদ। নরেশ গুহ আরও দেখিয়েছেন যে ইয়েট্‌স্ কীভাবে কালিদাসের 'শকুন্তলা' এবং 'ঋগ্‌বেদ' পাঠ করেছিলেন। এমনকি 'মুণ্ডক' উপনিষদের প্রভাবের কথা বলছেন। নরেশ গুহ দাবি করেছেন যে বেদান্তের আত্মসংযমব্রত ও ভাবমূলক ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কারণ এগুলির মধ্যে তিনি প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃত জগতের সংযোগ খুঁজে পাননি। বেদান্তের ধারণা তাঁকে দিয়েছিলেন মোহিনীমোহন। কিন্তু ইয়েট্‌স্ শেষমেষ পুরাণের উপরেই আস্থা রাখলেন কারণ পুরাণে তিনি খুঁজে পান অফুরন্ত প্রতীক

(symbol) যেগুলির মাধ্যমে তিনি আইরিশ মিথকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন। এবং এই প্রাথমিক পর্যায়ের পর ইয়েট্‌স্ ফিরে গিয়েছিলেন আইরিশ মিথলজিতে, যার উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর দীর্ঘ রোমান্টিক কবিতা 'দ্য ওয়াণ্ডারিংস অফ ওসিন' লিখেছিলেন। কিন্তু ইয়েট্‌সের নিজের স্বীকারোক্তির উপরে গিয়ে নরেশ গুহ এই কবিতাটির উপর চাপিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ভাবধারা। কবিতার তিনটি অধ্যায়কে তিনি দেখেছেন সত্ব, রজ ও তম গুণের নিরিখে। ইয়েট্‌স্ কি এতটাই ভারতীয় ভাবধারায় নিমজ্জিত ছিলেন যে তিনি যা বুঝতে পারেননি সেটি নরেশ গুহ বুঝেছিলেন?

ইয়েট্‌স্ ও ভারতবর্ষ যখন প্রসঙ্গ সেখানে রবীন্দ্রনাথ আসাটা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অবশ্য নরেশ গুহ কোনও কাব্যিক বিচার করেননি। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' এবং 'ডাকঘর' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ ও এ্যাবি থিয়েটারে সেটির প্রথম প্রদর্শন — এসব প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। নরেশ গুহ ইয়েট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার অনেক মিল দেখিয়েছেন এবং বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ইয়েট্‌স্ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর জীবনের আদর্শ — Unity of Being। তবে এক্ষেত্রে নরেশ গুহ একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সেটি হল ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ইয়েট্‌সের এই বাঙালির কবির প্রতি উষ্ণতা কেন কমে গেল? নরেশ গুহ দেখিয়েছেন কারণটি 'intellectual'। কেমন? না, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের যে বিমূর্ত ধারণাগুলি সাধনা বক্তৃতামালায় ব্যক্ত করেছেন সেগুলিকে ইয়েট্‌স্ গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি পুরাণভিত্তিক হিন্দু ভাবধারায় যে প্রতীকী ধারণা পেয়েছিলেন, সেগুলির প্রতি তাঁর অনেক বেশি আগ্রহ জন্মেছিল। নরেশ গুহ আরও বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের মিস্টিক ধারণাগুলি তাঁর গীতাঞ্জলি অধ্যায়ের পরে বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়ে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। তবে 'দ্য কিং অফ দ্য ডার্ক চেম্বার' নাটকের বিমূর্ত ধারণাগুলি ইয়েট্‌স্‌কে আকর্ষিত করেছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় ইয়েট্‌সের 'কিং অফ দ্য গ্রেট ক্লক টাওয়ার' কাব্যনাট্যে। নরেশ গুহর এই ধরনের সরলীকরণ অনেকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়নি, যেমন হয়নি তাঁর ইয়েট্‌সের তরুণ বয়েসের ভারতীয় ভাবধারায় প্রভাবিত কবিতার ব্যাখ্যা। এছাড়াও ইয়েট্‌স্ হয়ত রবীন্দ্রনাথের উপর কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কারণ 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে রবীন্দ্রনাথ থিওসফিকে কিছুটা বিদ্রূপ করেছেন। আমরা বলতে পারি যে নরেশ গুহর ইয়েট্‌সের অপ্রকাশিত চিঠি দেখার অবকাশ ছিল কারণ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা করেছেন রিচার্ড এলম্যানের মত একজন মুখ্য ইয়েট্‌স্ গবেষকের তত্ত্বাবধানে। ইয়েট্‌সের অপ্রকাশিত চিঠি দেখলে নরেশ গুহ বুঝতে পারতেন যে 'গীতাঞ্জলি' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের থিওসফিতে কিছুটা উৎসাহ ছিল!

নরেশ গুহর সবচেয়ে বড় অবদান যে তিনি ইয়েট্‌স্ গবেষকদের মধ্যে প্রথম যিনি ইয়েট্‌সের উপনিষদ ও পতঞ্জলি দর্শনের গভীর পাঠ করেছেন। ১৯৩০-এর দশকে ইয়েট্‌সের সাক্ষাৎ হয়, ও কিছুটা সখ্যতা গড়ে ওঠে, শ্রী পুরোহিত স্বামী নামক একজন ভারতীয় শিক্ষকের সঙ্গে, যিনি আজীবন ব্রহ্মচর্যের জীবন পালন করেছেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে ইয়েট্‌স্ পুরোহিত স্বামীকে দশটি উপনিষদ ইংরেজিতে অনুবাদ করতে সাহায্য করেন এবং সেগুলির দীর্ঘ ভূমিকাও লেখেন। তবে পুরোহিত স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই ইয়েট্‌স্ তাঁর বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'এ ভিশন'-এর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে (যদিও টাইটেল পেজে ১৯২৫ দেওয়া আছে)। 'এ ভিশন'-এর একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে, ইয়েট্‌সের মৃত্যুর দু'বছর আগে। 'এ ভিশন' অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে একটি কঠিন টেক্সট কারণ এর মধ্যে ইয়েট্‌স্ বিভিন্ন ধরণের ভাবনাকে একত্রিত করে মানব ইতিহাস ও সভ্যতার একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য যে এই 'এ ভিশন'-এ উপনিষদের ধারণাও ইয়েট্‌স্ টেনে এনেছেন। নরেশ গুহ 'এ ভিশন'-এর মধ্যে যে ভারতীয় ভাবনাগুলি আছে — উপনিষদ, পতঞ্জলি দর্শন, তন্ত্র এবং

যোগশাস্ত্র, সেগুলি ইয়েট্‌স্‌কে কতভাবে প্রভাবিত করেছিল তার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে। তবে তিনি ইয়েট্‌সের কবিতায় এর প্রভাব তেমন করে দেখাননি। যেটি সাহিত্যের পাঠকের কাছে অনেক বেশি লোভনীয় হত। সেই গবেষণা অনেক পরে করেছেন শালিনী সিক্কা তাঁর 'ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স্‌ এ্যাণ্ড দ্য উপনিষদস' (২০০২) গ্রন্থে। তবে শালিনী একটি কথা তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন যে কথাটি গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন যে ইয়েট্‌স্‌ যেসব গুহ্যবিদ্যার দ্বারা মোহিত ছিলেন, সেগুলি নিয়ে তাঁর মৃত্যুর ছয় দশক পরেও তেমন কোনও গবেষণা হয়নি। যাঁরা পরে কাজ করেছেন তাঁরা সকলেই পাশ্চাত্যের মানুষ। অদ্ভুতভাবে শালিনী নরেশ গুহর নাম একবারও উল্লেখ করেননি। এর কারণ আমাদের জানা নেই। তবে আমরা একবাক্যে বলতে পারি শালিনী সিক্কার অনেক আগেই নরেশ গুহ তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ ইয়েট্‌স্‌ বিশারদের তত্ত্বাবধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন এবং এই গবেষণার জন্য ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষার যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তার সবকিছুই নরেশ গুহর ছিল। সেই অর্থে, নরেশ গুহর ভারতীয় আঙ্গিকে ইয়েট্‌সের মতো একজন কবিকে নিয়ে গবেষণা 'authentic'।

শীর্ষেন্দু মজুমদার : প্রাবন্ধিক এবং বোলপুর কলেজের ইংরাজি বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর।